Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-4 Issue-1 July 2025

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ভাদুড়ি-সমগ্র': কৌতুক চরিত্র সদানন্দ বসু

শ্রেয়া তালুকদার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/22_Shreya-Talukder.pdf

সারসংক্ষেপ: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সৃষ্ট কমেডি চরিত্র সদানন্দ বসু। তাঁর এই চরিত্র পরোপকারী, হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল ও শান্তিপ্রিয় ব্যাক্তিত্ব হওয়ায় পাঠক মন জয় করেছে। তাই বলা যায়, গোয়েন্দা কাহিনিতে এমন চরিত্রের জুড়িমেলা ভার।

সূচক শব্দ: স্বার্থান্বেষী, পরোপকারী, বন্ধুবৎসল, পিতৃদেব, কন্দল।

মনুষ্যসমাজ রহস্যের প্রতি বরাবর কৌতূহল। প্রাত্যহিক যা কিছু অসংযত, ধোঁয়াশা মিশ্রিত, রোমাঞ্চকর যা আতঙ্কের সৃষ্টি করে তা থেকেই গোয়েন্দা গল্প ও উপন্যাসের উদ্ভব। বিশ্বসাহিত্যে ক্রাইম কাহিনি বিশেষ স্থানাধিকার করে আছে। আর সেই সূত্রবহাল হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনি আবির্ভাবের অনেক আগেই বিদেশি সাহিত্যে এর উদ্ভব ঘটলেও বঙ্গো এই সাহিত্যও পিছিয়ে থাকেনি। মহান লেখকদের লেখনকলায় যা হয়ে উঠেছে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কাল্পনিক ঘটনায় মানুষকে মূঢ় বানানো সহজ নয়। কারণ, মানুষ বুঝতে শিখেছে বিষয়লুব্ধ, স্বার্থান্বেষী, হিংসাজনিত ঘটনাকে ভিত্তি করেই খুন, অপহরণ, চুরি হয়। আর, এ থেকে উত্তরণ হতে গেলে বা সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে গেলে অপরাধীকে সনাক্তকরণ করা খুবই অবশ্যম্ভাবী। এটা অনেক সময় পুলিশের পক্ষে একা করা সম্ভবপর হয় না, সেইজন্য প্রাইভেট ডিটেকটিভ সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। পুলিশের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ থাকলেও অনেক সময় অপরাধী ধরা পড়ে না। তখন প্রাইভেট গোয়েন্দার দারস্ত হতে হয় সাধারণ মানুষকে। আর গোয়েন্দা নিজস্ব বুদ্ধিবলে গোপন তথ্য সংগ্রহ করে, তা থেকে নিরাপরাধ মানুষদের মুক্তি দেন এবং অপরাধীকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু তাঁর একারপক্ষে করা সম্ভব নয় তাই অনেক ক্ষেত্রে সহকারী বন্ধু হিসেবে কাউকে নিযুক্ত করেন। তেমনি একটি চরিত্র নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ভাদুড়ি-সমগ্র'এর সদানন্দ বসু।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪ — ২০১৮) ঢাকা ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত একজন কবি ও সাংবাদিক এবং 'অমলকান্তির' স্রষ্টা। কিন্তু তিনি বিশ্বসংসারের কাছে কবি হিসেবে পরিচিত মুখ। অপ্রত্যাশিতভাবে পঞ্চাশের দশকে রমাপদ চৌধুরীর আনন্দবাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয়তে রহস্যগল্প লিখতে শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব আগ্রহবোধ কতটা ছিল সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়, কারণ অল্প কয়েকটি গল্প লিখেই তিনি ছেদ টানেন। এবং অধিকসময় এই বিষয় থেকে নির্বাসন নেন। এরপর অনেক সময় অতিক্রান্ত করে পুত্রবধূ কাকলি চক্রবর্তীর (বর্তমান পত্রিকার 'রবিবার' শারদীয়া সংখ্যার সম্পাদিকা) হাত ধরে আবার গোয়েন্দা গল্পলেখায় পদার্পণ করেন। আর বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য পেয়ে যায় এক অনবদ্য সাহিত্যের স্বাদ। যা রহস্য গল্পপ্রেমী পাঠকের কাছে মাইলফলক হয়ে ধরা দেয়। যাঁরা বরাবর গোয়েন্দা গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত তাঁদের টক্কর দিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সৃষ্টি করলেন সত্তর বছরের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর চারুচন্দ্র ভাদুড়ি, সহকারী বন্ধু সাংবাদিক কিরণ চট্টোপাধ্যায় ও হাস্যরস সৃষ্টিকারী চরিত্র সদানন্দ বসু। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো গোয়েন্দা উপন্যাসে হাস্যরস সৃষ্টি। যেখানে গোয়েন্দা গল্প মূলত চুরি, খুন, রাহাজানি, নোটজাল, যৌনতা, পারিবারিক কন্দল কেন্দ্রিক, সেখানে ঔপন্যাসিকের সদানন্দ বাবু কমিক চরিত্র সৃষ্টি এক নিপুণ দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে।

সদানন্দ বাবু পুরো নাম সদানন্দ বসু। বয়স বাহাত্তর বছর হলেও দেখে বোঝা দায়। ভীষণ পরোপকারী, হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল স্বভাবের, সর্বদা মানুষের উপকার করতে ভালোবাসেন তা কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, প্রায় গায়ে পড়েই করেন। ভদ্রলোকের চুল কাঁচা পাকা মিশ্রিত। বছর দুয়েক আগে ছানি কাটিয়েছেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি ঠিক হয়নি। জন্মসূত্রে সচ্ছল মানুষ তাঁর মুখ যেন মনের আয়নার মতো। সবসময় ঝকঝকে প্রশান্ত হাস্য তাতে ঝাপসাভাব কখনো দেখা যায় না। আর শারীরিক যন্ত্রণা বলতে তেমন কোনো রোগবিরোগ নেই। শরীর পোক্ত, পেটে মেদ জমতে দেননি, রোজ মাইল দুয়েক হাঁটেন। তাঁর কথায় — "ঘড়িতে রোজ দম দিতে হয় না? তা এই মনিং ওয়াকটা হচ্ছে শরীরকে দম দেওয়ার ব্যাপার, দমটা নিয়মিত দিচ্ছি বলে ঘড়িটা এখনও বন্ধ হয়নি, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় কারেক্ট টাইম দিয়ে যাচ্ছে।"[১] নিজের শরীর সম্পর্কে বিশেষ সচেতন, দুধ চিনি ছাড়া, স্রেফ হালকা লিকারে চা খান দিনে তিনবার। কারণ পিতৃদেবের আদেশ — "সার পি.সি রায় বলেছেন চা পান মানেই বিষপান আর আমার স্বর্গত পিতৃদেব বলতেন বিষপান তো বটেই তবে কিনা দুধ চিনি মিশিয়ে যদি খাই।"[২]কোনো নেশায় আসক্ত নন। প্রতিদিন ভোর সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে ওঠেন। শীতকালেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। তারপর চোখ-মুখ ধুঁয়ে নিজে হাতে স্টোপ জ্বালিয়ে এককাপ চা খেয়ে পোষাক পাল্টে বেরিয়ে পড়েন পাঁচটা নাগাদ। গোদরেজের টানা তালা সদর দরজায় দিয়ে। শীতে তিনি এমন পোষাক পরেন একদম জাম্বুবানের মতো মনে হয়। গায়ে বিশাল অলেস্টার, পায়ে বুট জুতো, মাথায় মাঙ্কি-ক্যাপ শুধু চোখ দুটো আর নাকের ফুটো বেরিয়ে থাকে। হাতে থাকে একটা মোটা বেতের লাঠি ও টর্চ। লাঠির মাথায় আবার লোহার বল বসানো। কারণ একবার প্রাত ভ্রমণের সময় কুকুর তাঁকে তাড়া করে ও কামড় দেয়। দেহের বিষয়ে ভীষণ সচেতন তাই কোনোদিন আধঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট নয় পুরোপুরি এক ঘন্টা হাঁটবেন। আর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গিয়ে ছয় চক্কর মেরে বাড়িতে ফিরবেন। ঘরে ফিরে আবার চা বসাবেন দু-কাপ, নিজের আর স্ত্রী জন্য। এরপর দৈনন্দিন কাজে নিমজ্জিত হবেন। সাতটায় দুধ এনে বাজার করতে যান। বাড়ির কাছের বৈঠকখানার বাজার ছেড়ে হ্যারিসন রোডে যান। সেখানে সারিবদ্ধভাবে বাজার বসলেও একঘন্টায় বাজার হয় না দরদস্তুর করতে বেশ ভালোবাসেন। ফিরে জলখাবার খান চা ছাড়া সঙ্গে 'দৈনিক সমাচার' পত্রিকা পড়েন। এরপর চা খাবেন বিকেল চারটায়। অনেক সময় রুটিনের বাইরে গিয়ে কেউ চায়ের নিমন্ত্রণ করলে তা খেয়ে নেন।

সদানন্দ বাবুর পিতার নাম মহানন্দ বসু। পিতামহ দয়ানন্দ ও প্রপিতামহ শ্যামানন্দ বসু। প্রত্যেকের একটি করে পুত্র সন্তান। শুধু সদানন্দ বাবুই নিঃসন্তান। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাড়ির ভাঁড়াটের মেয়ে কমলিকে দত্তক নেন। পূর্বপুরুষের কোনো স্থাবর অস্থাবর ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি কারণ একাধিক পুত্রসন্তান কারো নেই। আর কুপ্রবৃত্তির মানুষও কেউ ছিলেন না। একমাত্র নেশায় আসক্ত ছিলেন ঠাকুরদা দয়ানন্দ। তা ঘুড়ি ও পায়রা ওড়ানোর মতো বদখেয়ালে মজে থাকতেন। পাঁচ নম্বর পীতাম্বর চৌধুরী লেনে সদানন্দ বসু বসবাস করেন। সদর দরজার পাশ দিয়ে দেওয়ালে চোখ পড়লেই দেখা যায় শ্বেতপাথরের ট্যাবলেটে বাড়ির নাম 'শ্যামনিবাস' নীচে ১৮৭০ সাল। বাড়িটি একশো বছরের পুরনো যার নির্মাতা সদানন্দ বাবুর পিতামহ দয়ানন্দ বসু। বাড়িটি বড়ো নয়। দোতলা-একতলা মিলে মোট চারটে ঘর। ঘরগুলি এমনভাবে তৈরি যাতে ভাগবাটরা হলেও শরিকের অসুবিধে না হয়। উপরতলা যেমন রান্নাঘর একটা ভাঁড়ার ঘর বাথরুম, নীচেও সেইরকম। তিনি সওদাগরি কোম্পানির শিপিং ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ছিলেন। বছর দুয়েক এক্সটেনশানের পর রিটায়ার করেছেন বছর দশেক আগে। কাজ খুব একটা উঁচু দরে না হলেও মাঝে মধ্যে দু-চার টাকা উপরি রোজগার হতো। এতে অনায়াসে সংসার চলে যেত। সদানন্দ বাবুর স্ত্রী কুসুমবালা বসু। দুজনের সুখের সংসার। বাতজ ব্যাথায় ভীষণ কষ্টপান বটে তবে সদানন্দ বাবু এবিষয়ে ভীষণ সচেতন মাসান্তে ডাক্তার দেখান এবং ওষুধ খাওয়ান। স্ত্রী আড়ালে বলেন তাকে ভয় পান না কিন্তু ভীষণ ভয় পান সামনে কুলুটি নাড়েন না। ভদ্রমহিলা নানা গুণের অধিকারী। নিজস্ব সন্তান নেই হাতে অধিক সময় তাই ঘরকন্যা কাজ সেরে সেলাই, এমব্রয়ডারি, ইত্যাদি বিদ্যা রপ্ত করেছেন। দেশ-বিদেশের নানা পদ রাঁধতেও জানেন। এছাড়া ব্লাউস, পাঞ্জাবি, শার্ট, স্কার্ট, ইজের প্যান্ট ফ্রক ইত্যাদি ছাঁটকাট করে সুন্দর সেলাই করতে পারেন তার উপরে তালিম দেন। সেসব শিখতে পাড়ার মেয়ে বউরা আসেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ভাদুড়ি-সমগ্র' মোট সতেরোটি উপন্যাস রয়েছে তার মধ্যে পনেরোটি উপন্যাসে সদানন্দ বাবু চরিত্রটি বিদ্যমান। তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হলো গল্পবলার প্রবণতা যা পাঠক মনে হাস্যরস সৃষ্টি করে। তিনি যে-কোনো বিষয়কে অবলম্বন করেই গল্প বলতে শুরু করেন, নিজেকে সব বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ভাবেন। অনেক সময় তা অতিরঞ্জিত করে বলে থাকেন পার্শ্ববর্তী লোকেদের মনোরঞ্জন করার জন্য। এতে সবাই আনন্দ উপভোগ করেন। "ভাবছি এই শহরটার কথা, এই কলকাতার কথা। উঃ, কী শহর কী হয়ে গেল! আগে এখানে রাস্তার উপরে একটা জিলিপি পড়ে থাকলেও সেটা তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলা যেত। আর সেই শহরে এখন কিনা নাকে রুমাল না-চেপে সাহেবপাড়ার রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না।"[৩] সে ভীতু স্বভাবের মানুষ রোমহর্ষক গল্প শুনলে ভয়ে কুঁকড়ে যান, চোখ গোল গোল করে সোফার উপরে জোড়াসন হয়ে বসেন। হিপনোটাইজ গল্প শুনে তাঁর পৈতৃকবাড়ি তারকেশ্বরের একটি লোককে কুমিড় বানিয়ে দেবার কথা বলেন। কুসংস্কারে ভীষণ ভাবে বিশ্বাসী। মাঝে মাঝে এমন আশ্চর্য জনক কথা বলেন যা শুনে সকলে অবাক হয়ে যায়। তিনি পালিত কন্যা কমলিকে নিয়ে একবার চিড়িয়াখানা বেড়াতে গিয়ে শিম্পাজিকে সিগারেট খেতে দেখেছেন। বলে, তারা নাকি এখন মানুষের নকল শুরু করে দিয়েছে। বহুক্ষেত্রে অপরাধী ধরার সময় নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন 'রাত তখন তিনটে' উপন্যাসের দৃষ্টান্ত, ছেলেটাকে যে বাবা অ্যাকসিডেন্ট করিয়েছেন তা তিনি ধরতে পারেন। এছাড়া অনেক উপন্যাসে অপরাধের কিছু আভাস নিজের গল্প বলার ছলে বলেছেন, তা আপাত দৃষ্টিতে হাস্যরস সৃষ্টি করলেও অপরাধীকে তা সনাক্ত করতে সহায়তা করেছে। সদানন্দ বাবু শান্তিপ্রিয় লোক। 'আড়ালে আছে কালীচরণ' উপন্যাসে ঘোষ-দম্পতির কথা শুনে প্রায় সিঁটিয়ে বলেন "এ তো ডেঞ্জারাস উয়োম্যান। এই রকমের বউ নিয়ে ঘর করতে হলে তো মারা পড়তুম মশাই।"[৪]

'ভুতুড়ে ফুটবল' উপন্যাসে সুলতানপুর স্পোর্টিং আর পোড়াবাজার ইলেভেন সেমিফাইনাল, গল্পের মূল প্লট। কিন্তু সদানন্দ বাবু হাবলা বাঁড়ুজ্যে নামে দেশের বাড়ির এক খেলোয়ারের প্রসঙ্গ আনেন যা এক ভূতুড়ে গল্প। তিনি নাকি ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন তার খেলা সদানন্দ বাবু দেখেছেন। হরিচরণ মেমোরিয়াল শিল্ডের খেলায় চুঁচড়ো ইউনাইটেডকে একাই একডজন গোল দিয়েছেন। মোহনবাগান হয়ে খেলার কথা ছিল কিন্তু তা সাকসেসফুল হয়নি। খেলার কথা বলতে বলতে হঠাৎ রোমাঞ্চকর প্রসঙ্গো চলে আসেন। তাঁকে বাঁশবেড়ে হংসেশ্বরী স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গো কামারকুণ্ডুর স্পেক্টেট ফাইনাল ম্যাচে নামানো হবে বলে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বুকিং করা হয়েছিল, জেতার পরে আরো পঁচিশ টাকা দেওয়া হবে। সে টাকা হাতে না নিয়ে মাকে টাকা দিতে বলেন আর সাইকেলে উঠে চলে যান। বাড়ি বয়ে দেখা যায় "হাবলার মা শুকনো মুকে বারান্দায় বসে আচেন। আমরা তাকে কিছু বলার সুযোগ পেলুম না। তার আগেই তিনি আঁচলের গিঁট খুলে দশ টাকার পাঁচখানা নোট বার করে বললেন কিচু মনে কোরো না বাবারা, পরশু রাত্তির থেকেই আমার ছেলের ধুম জ্বর, তাই তোমাদের হয়ে খেলতে যেতে পারেনি। যে-টাকাটা দিয়ে গেসলে, সেটা ফিরিয়ে নে যাও বাবা।"[৫] তাতে সকলের চোখ চক্ষু চড়কগাছ কারণ অবিকল তার মতো দেখতে যে লোকটা হাফটাইমের আগে গোল দিল সাত-সাতটা তবে সে কে? ফুটবলের গল্প বলতে সে ভূতের গল্প চলে যান তাঁর কথায় মাঠে যারা বল পেটান তার মধ্যে অর্ধেক জেনুইন মানুষ নয়। আসলে তেনাদেরও নাকি ফুটবল খেলার সখ হয়, 'নরমুণ্ডু দিয়ে গেণ্ডুয়া' খেলার প্রসঙ্গা উত্থাপন করেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ভাদুড়ি-সমগ্র' সিরিজে সদানন্দ বসু চরিত্রটি খুবই উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্র যেমন পাঠক মনে হাস্যরস তৈরি করেছে তেমনি গোয়েন্দা গল্পকে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে। 'ফেলুদা' গল্পের লালমোহন গাঙ্গুলীর সঙ্গো এই চরিত্রকে তুলনা করা যেতে পারে। গোয়েন্দা গল্প খুন, ছিনতাই, নোটজাল, ধর্ষণ কেন্দ্রিক হয়ে থাকে আর তাকে ঘিরে কাহিনির গোড়াপত্তন হয়। যা পড়তে পড়তে পাঠক মনে ক্লান্তি তৈরি হয়, তা থেকে স্বস্তির আশ্বাস দিয়েছেন সদানন্দ বসু। 'শ্যামনিবাস রহস্য'এ কাহিনির বয়ন যত গাঢ় হয়েছে, সদানন্দ বাবু চরিত্র অনেক পোক্ত হয়েছে, হাস্যরস তৈরি করলেও তা পরিপক্কতা বহন করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. ‘ভাদুড়ি সমগ্র’(প্রথম খণ্ড), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, ১৩বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, কলকাতা পুস্তকমেলা জানুআরি ২০০৬, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৯ পৃ. ১৪০

২. ওই, পৃ. ১৪১

৩. ওই, পৃ. ২২৫

৪. ‘ভাদুড়ি সমগ্র’(দ্বিতীয় খণ্ড), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, ১৩বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০৬, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ৩৬৯

৫. ‘ভাদুড়ি সমগ্র’(তৃতীয় খণ্ড), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দে’জ পাবলিশিং, ১৩বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০০৭, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ৮৫

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ‘গোয়েন্দা-সাহিত্য ব্যোমকেশ বক্সী ও অন্যান্য’, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ২০১৩

২. ‘গোয়েন্দা সাহিত্য অপরাধ মনস্তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি’, বিশ্বজিৎ কর্মকার, লহর পাবলিকেশন হাউসবি-৫/৪৪, কল্যাণী নদীয়া, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৪২১

৩. ‘ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি’, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর, ১৯৮৮

৪. ‘কীভাবে গবেষণা করবেন’, সুদীপ বসু, বইওয়ালা বুক ক্যাফে, রতনপল্লি, শান্তিনিকেতন ৭৩১২৩৫, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০২৪

পত্র-পত্রিকা :

১. কমলিনী চক্রবর্তী, ‘সুখী গৃহকোণ’, ১ ফেব্রুআরি ২০১৯

২. মহ. সইফুল ইসলাম, ‘গোয়েন্দা চারুচন্দ্র ভাদুড়ির জীবন ও পরিচয়’, Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) July 2023

৩. স্মৃতিকণা চক্রবর্তী, ‘কবি নীরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সি. বি. আই-এর দপ্তর’, ‘কোরক’, ‘বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা’, প্রাক্ শারদ ১৪২০ বঙ্গাব্দ

লেখক পরিচিতি: শ্রেয়া তালুকদার, পিএইচ.ডি গবেষিকা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।